আর ১৯০০-র দশকে মহামারী আর দুর্ভিক্ষের বন্যা বয়ে যায়। ফলে প্রশাসন সক্রিয়ভাবে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। কখনো কখনো সে-সক্রিয়তা অকল্পনীয় জুলুমে পর্যবসিত হত। হ্যাফকিন-এর সদ্য-উদ্ভাবিত প্লেগ-সিরামটি তখনই ব্যাপকভাবে কাজে লাগে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় প্লেগ-আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার জন্য আসুরিক সব পদ্ধতি, যা ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ, এমনকি কখনো কখনো সহিংসতারও জন্ম দেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কার্জন ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতাদর্শগত উপকারিতার গুণকীর্তন করা থামাননি। অবশ্য কার্জনকে কোনো ব্যাপারেই থামানো সহজ ছিল না। ১৮৯৯-এ একটি চিকিৎসাবিজ্ঞান অধিবেশনে তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশরা ভারতকে যেসব 'উপহার' দিয়েছে, তার মধ্যে আইন, খ্রিস্টধর্ম আর সাহিত্য নিয়ে যদি-বা কোনো প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞান নিয়ে, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে, কখনো কোনো প্রশ্ন উঠবে না। কেননা, তিনি জানান, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি হল 'বিশুদ্ধ, অকাট্য, কঠিন বিজ্ঞান।' কোনোরকম 'অশ্রদ্ধা' প্রদর্শন না-করে কিংবা 'বিহিত আচারভঙ্গ' না করেই তা পর্দাপ্রথা আর জাতপাতের বাধা দূর করতে সক্ষম। তাঁর মতে, ব্রিটিশ শাসনের সপক্ষে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি হল চিকিৎসাবিজ্ঞান।[৭৬]

সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক বৈজ্ঞানিক কাঠামোটি ছিল গভীরভাবে জাতিবিদ্বেষী। বৈষম্য আর দূরে সরিয়ে রাখার প্রথা ব্যাপক ছিল। ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর ভারতের পদ্ধতিগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হত। যেসব ভারতীয় কিছু বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল, যাদের সংখ্যাটা ক্রমেই বাড়ছিল, তাদের কাছে এ ব্যাপারটা উত্তরোত্তর বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যখন রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ দিতে চাইলেন, তখন এই বৈষম্যের ব্যাপারটা আরো প্রকট হয়ে উঠল। প্রমথনাথ বসুর ঘটনাটা সুবিদিত। তিনি লন্ডন থেকে ভূতত্ত্বে ডিগ্রি নিয়ে ফেরেন, কিন্তু জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে তাঁর কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক সন্দেহ করতেন যে 'একজন বাঙালি হিসেবে . . . তিনি হয়তো ওই কাজের পক্ষে শারীরিকভাবে অক্ষম।' ১৯০৩ সালে চাকরি ক্ষেত্রে বসুর চেয়ে দশ বছরের ছোটো একজন ইংরেজকে যখন ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে বসানো হল, তখন বসু পদত্যাগ করেন। পরে তিনি টাটাদের জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার জন্য ওড়িশার কেওনঝর-এ লোহার খনি আবিষ্কার করেন। তবে উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদের যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত ভারতীয়দের মনোভাব স্বভাবতই খুব বিমিশ্র ছিল, তা সামগ্রিক প্রত্যাখ্যানের পথে যায়নি। একটু পরেই আমরা সেটা দেখতে পাব।

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography